সই কথা

নন্দিতা কর

স্বামী কর্মসূত্রে বিদেশবাসী। একমাত্র কন্যা বেঙ্গালুরুতে মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে পড়ছে। ছুটিছাটায় বাড়ি আসে। একটু একটু করে অনেক যত্নে তৈরী করা বাড়িটাকে এখন আর আগের মতো যত্ন করতে ইচ্ছে করে না।

জানালার গ্রিলে, দরজায় ধূলোর আস্তরণ। একমাত্র নেশা বই পড়ায় এখন ভাঁটার টান। রান্নার সখও অস্তগামী। নিজের জন্য বাজার করতে, রকমারি রান্না করতে কার ভালো লাগে? কোনো রকমের একটু ঝোলভাতই যথেষ্ট বলে মনে হয়।

এতবড় বাড়িটা যেন হাঁ করে গিলতে আসে। নাঃ বইয়ের নেশাটাকেই আবার ঘাড় ধরে ফিরিয়ে আনতে হবে। পুরানো মেহগিনি কাঠের বইয়ের আলমারিটা দেখতে দেখতে ভাবে মণিকা।

থাকে থাকে বিভিন্ন রচনাবলী সাজানো। একপাশে আবার কিছু পত্রপত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন, ডায়েরি। একসময় পদ্য লেখার ভূত ছিল যে মাথায়।

ডায়রিটা বের করে নাড়াচাড়া করতে করতে বেরিয়ে পড়ে কলেজের বন্ধুদের নাম ঠিকানা ফোননাম্বার। আরে! এই ডায়রিটা এখানে এভাবে পড়েছিল। ওদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করলে মন্দ হয় না।

কর্ডলেসটা নিয়ে সোফায় বসে পড়ে মণিকা। একটার পর একটা ডায়াল করতে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই টেলিফোনের ঘ্যানঘ্যানানি— দুঃখিত এই নম্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। বাংলা ইংরাজি হিন্দিতে একই কথা শুনতে শুনতে মণিকা যখন প্রায় হতাশ, ঠিক তখনই অন্যপ্রান্তে হঠাৎ ঘুঘুর ডাক। সোনালী, রোগা-সোগা মিষ্টি-মিষ্টি। বিয়ের পর বছর খানেক যোগাযোগ ছিল তারপর সংসারের চাপে আস্তে আস্তে...

—হ্যালো।

মণিকা কয়েক মুহূর্ত চুপ। কি বলবে? চিনতে পারবে তো? ওপারে অধৈর্য্য খরখরানি।

—কে বলছেন। কথা বলছেন না কেন?

—আমি...মানে...আমি কি একটু সোনালী সেনের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

—এ বাড়িতে সোনালী সেন বলে কেউ থাকে না। সশব্দ খটাশ। সেকি! এটা তো সোনালীরই নম্বর। ডিভোর্স টিভোস' হয়ে গেল নাকি? আবার ডায়াল করে মণিকা। আবার সেই খরখরে কণ্ঠস্বর।

—হ্যালো।

এবার মণিকা প্রশ্ন করে

—কে বলছেন?

—আমি রেবা।

—বৌদিকে একটু ডেকে দিন তো।

—বৌদি-ই আপনার ফোন।

—কার?

—কি জানি আপনাকে ডাকতেছে।

—হ্যালো, কে বলছেন?

—আমি কি সোনালী সেনের সঙ্গে কথা বলছি?

—হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?

বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ

—আমি মানে আমি মণিকা মিত্র।

—কে মণিকা মিত্র? আমি তো ঠিক চিনতে পারছি না।

এ কি বলেরে বাবা!

—মারবো টেনে এক থাপ্পড়। পঞ্চপাণ্ডবকে ভুলে গেলি।

—একি...সরি সরি। মণি, আগে বলবি তো।

—আর আগে বলবি।

মণিকা সোনালীকে ভেংচে বলে

—আমি তো কোনো মণিকা মিত্রকে চিনি না।

—প্লিজ কিছু মনে করিস না। এত বছর পর হঠাৎ কার মনে পড়ে বল? তা এত দিন পর কি মনে করে।

—এমনি-ই। একটা পুরানো ডায়রি হাতে এসে গেল, ভাবলাম দেখি যোগাযোগ করা যায় কি না।

—খুব ভালো করেছিল রে। রেবা— গ্যাসটা বন্ধ করে দে তো।

—ওমা তুই এখন রান্না করছিস। ব্যস্ত তার মানে।

—ছেলে মেয়ে বর খেয়ে বেরোবে তো।

—তা তো ঠিকই। সুজনদা তো ব্যাঙ্কে। ছেলে মেয়েরা কে কি করছে?

—ছেলে ডাক্তারি পড়ছে, ফাইনাল ইয়ারে। মেয়ের ক্লাস নাইন।

—বাঃ খুব ভালো। যাব একদিন তোর বাড়ি। রাখছি এখন, তুই রান্নাঘর সামলা।

২

ফোন রাখতেই মেজাজটা ফুরফুরে হয়ে যায় মণিকার। অনেকদিন পর গুনগুনিয়ে ওঠে। মনে মনে ফিরে যায় কলেজের সেই রঙিন দিনগুলিতে। মণিকা, শেফালি, এষণা, গার্গী, সোনালী। কলেজে সবাই ডাকত পঞ্চপাণ্ডব। একটা বেঞ্চে গাদাগাদি করে পাঁচজন বসতো।

মিলেমিশে টিফিন ভাগ করে খাওয়া, ক্লাসমেটদের পিছনে লাগা, ফুচকা খাওয়া, ক্লাস কেটে সিনেমা দেখা — একে একে সব মনে পড়ল।

সোনালীটার সঙ্গে কি বাকি তিনজনের যোগাযোগ আছে? ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলেও বেশ হত।

৩

সপ্তাহখানের বাদে মণিকা হঠাৎ সোনালীকে কিছু না জানিয়েই রওনা দেয় ওর বাড়ির দিকে। বেশ অবাক করে দেওয়া যাবে— মনে মনে ভাবে মণিকা।

পাতালরেলের কল্যাণে দক্ষিণ থেকে উত্তর কলকাতায় যাওয়া এখন অনেক সহজসাধ্য। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে সোনালীর বাড়ি পৌঁছে যায় মণিকা। মজা করার জন্য বেল না টিপে বন্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে মোবাইল থেকে সোনালীর নম্বরে ফোন করে মণিকা।

—হ্যালো?

—আমি মণি বলছি।

—বল। কিরে কবে আসবি?

—যাচ্ছি তো তোর বাড়ি।

—কবে?

—এক্ষুণি।

—তুই কোথা থেকে ফোন করছিস?

—তোর বন্ধ দরজার ওপার থেকে।

—ভ্যাট সত্যি!

—দরজাটা খুলেই দ্যাখোনা সোনা।

—তুই একটা আস্ত পাগল। আসার আগে একটা ফোন করবি তো।

—করলাম তো

—ইয়ার্কি মারিস না, ভেতরে আয়। উফ্, কতদিন পরে দেখা। আমার যে কি রকম লাগছে না...

—কি রকম লাগছে?

—অবাক লাগছে, আনন্দ লাগছে, আগে ফোন করে না আসার জন্য রাগ হচ্ছে।

—তার মানে একটা খিচুড়ি মার্কা অনুভূতি বল?

মণিকা হাসতে হাসতে বলে।

—তুই তো দেখছি একইরকম ফোক্কড় রয়ে গেছিস। বোস, ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছিস।

সুন্দর করে সাজানো ড্রইংরুম। সচ্ছলতা ও রুচিবোধের মেলবন্ধন।

—বাঃ বেশ সাজিয়েছিস তো

—ওই একরকম। বোস, তোর জন্য জল আনি।

এসিটা বাড়িয়ে দিয়ে ভেতরে যায় সোনালী। একটু পরেই ফোনের ঘন্টি বেজে ওঠে।

—দ্যাখ তো মণি কে ফোন করেছে।

মণিকা রিসিভার তোলে।

—হ্যালো।

—কে সোনা?

—না আমি মণিকা বলছি। আপনি কে বলছেন?

—আমি সুজন সেন বলছি। সোনালীকে ফোনটা একটু দেবেন।

—হ্যাঁ দিচ্ছি। সোনা, সুজনদার ফোন।

—ও আচ্ছা। আমি ও ঘর থেকে তুলছি। তুই রেখে দিস।

—কে এসেছে?

—মণিকা, আমার বন্ধু।

—কে মণিকা? নতুন বন্ধু?

—আমার কলেজের বন্ধু। সেই যে গো, আমাদের পাঁচজনের গ্রুপের কথা বলেছিলাম না। বিয়ের পর এসেছিল এ বাড়িতে তোমার মনে নেই।

—আমার অত মনে টনে নেই। তা এতদিন বাদে কি মনে করে।

—আমি কি করে জানবো। বন্ধু বন্ধুর বাড়িতে এসেছে, এতে আবার ভাবার কি আছে আশ্চর্য তো রাখছি এখন।

—কায়দা করে জেনে নিও। কে যে কি মতলবে ঘোরে বলা যায় না।

মনটা অনেকদিন পর মণিকাকে পেয়ে বেশ উচ্ছল হয়ে উঠেছিল, সুজনের কথায় কেমন যেন ছানা কেটে গেল। মুখের হাসিটা জোর করে মুখে সেঁটে ঠান্ডা পানীয়ের বোতল নিয়ে বসার ঘরে ঢোকে সোনালী।

৪

ঘন্টাখানেক কেটে গেল পুরানো দিনের কথা নিয়ে কলকল ছলছল করে। তার মধ্যেই কয়েকবার সুজনের প্রশ্নটা লুকিয়ে থাকা ছারপোকার মতো কুট কুট করে কামড় লাগায় মনে। থাকতে না পেরে সোনালী জিজ্ঞাসা করে।

—তারপর বল, হঠাৎ কি মনে করে।

—কি মনে করে মানে? এমনি-ই।

—এমনি-ই। অবশ্য তাতে আশ্চর্য কিচ্ছু নেই। মনে আছে স্রেফ ভালো লাগে বলে ক্লাস কেটে কতবার তুই দোতলা বাসের দোতলার সামনে বসে গোলপার্ক থেকে ডানলপ পর্যন্ত চলে গেছিস। আমাদেরও জোর করে টেনে নিয়ে গেছিস।

—তোর মনে আছে? কি মজা লাগতো বল।

—তোর তো বলছিলি একটা মেয়ে? কি করছে ও এখন। উদয়ণদার খবর কি?

আচ্ছা প্রশ্নগুলো কি জেরার মতো শোনাচ্ছে। মণিকা কি কিছু মনে করছে। সোনালীর মধ্যে অপরাধবোধ খেলা করে। কি করবে সোনালী? সুজন ওর থেকে বাইরের দুনিয়াটা অনেক বেশী চেনা। সত্যিই তো কত রকমের প্রতারণার কথা পেপারে লেখে। সোনালী গুছিয়ে বসে।

—মাইক্রো বায়োলজি নিয়ে বেঙ্গালুরুতে পড়ছে। ফাস্ট ইয়ার। আরে ও চলে যাওয়ার পরেই তো এত একা হয়ে গেছি। মেয়ের পড়াশুনার জন্যই তো এখানে পড়ে আছি। নইলে করে চলে যেতাম তোর উদয়ণদার কাছে।

—উদয়ণদা এখন কোথায় আছে রে?

—স্টেট্‌সে। কোম্পানী সেই এক বছরের নাম করে পাঠাল, চার বছর কেটে গেল এখনও ফেরানোর নান নেই।

—তুই তো ঘুরে এলেই পারিস।

—গিয়েছিলাম তো। মেয়ের মাধ্যমিকের পর। তোর মেয়ে কখন ফিরবে রে?

—একটু পরই। তোর কথা ওকে অনেক বলেছি।

আবার ফোন বেজে ওঠে। হ্যান্ডসেটটা সোনালী আগেই শোবার ঘর থেকে নিয়ে এসেছিল। অন করে বলল।

—হ্যালো।

—আমি বলছি।

—হ্যাঁ বলো। বললাম তো এখন ভাল আছি।

—কেন এসেছে কিছু বলেছে?

সোনালী হ্যান্ডসেটটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। চোরা চোখে চায় মণিকার দিকে। একটু হেসে ভিতরের দিকে হাঁটা লাগায়। চাপা গলায় বলে

—বলছে তো এমনি। খুব একা লাগছিল।

—দেখো খুব সাবধান। কিসে এসেছে? গাড়ীতে?

—না টিউবে।

মণিকা মনে মনে একটু ঈর্ষা বোধ করে। বাবা বিয়ের এত বছর পরও এদের মধ্যে এত অনুরাগ। ঘন্টায় ঘন্টায় ফোন। কিছুক্ষণ দোটানায় থেকে এ ঘরের ফোনের রিসিভারটা সাবধানে ওঠায় মণিকা। বন্ধু, বন্ধুর বরের ফোনালাপে আড়ি পাতা যেতেই পারে।

—একা লাগছে কেন? বাড়িতে কেউ নেই।

—না। বলছে মেয়ে বেঙ্গালুরুতে, স্বামী স্টেট্‌সে।

—বর ডলারে কামাচ্ছে আর তোমার বন্ধু ট্রেনে এসেছে? গাড়ী কেনেনি।

—সে কি গো, দুজন মহিলা এতক্ষণ বসে গল্প করলে আর বাড়ি গাড়ী গয়নার কথা আলোচনা করলে না।

—না করলাম না। তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

—আমার তো একটা অসুবিধা। আমার বৌটা ভীষণ সরল আর বোকা। সেইসঙ্গে সবাইকে নিজের মতো মনে করে।

—তোমার মাথা।

—তা ওনার ছেলে পিলে কটি।

—একটা মেয়ে। বেঙ্গালুরুতে পড়ছে।

—এবার বোধকরি খানিকটা বোঝা গেল।

—কি আবার বোঝা গেল?

সোনালীর গলায় অধৈর্যের রেশ।

—হয় এডুকেশন লোনের তদ্বির অথবা...

—ওর মেয়েকে পড়াতে লোন করবে কেন? বলছি না ওর বর স্টেট্‌সে থাকে, ওর টাকার কি দরকার?

—আরে তোমার সঙ্গে এত বছর পরে দেখা, বন্ধু যা বলছে তাই সত্যি বলে ধরে নিচ্ছ কেন? তাছাড়া আরেকটা ব্যাপারও হতে পারে। তোমাকে এর আগে ফোন করেছিল?

—হ্যাঁ করেছিল। সপ্তাহখানেক আগে। তোমাকে বলেছিলাম তো।

—বলেছিলে? কি জানি আমার মনে নেই।

—তা থাকবে কেন? বৌ-এর কোনো কথায় মন দেবার সময় কোথায়?

সোনালী ঝাঁঝিয়ে ওঠে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে মেজাজ তেতে উঠেছে। ওপাশে সুজনের গলা।

—শোনো ঠান্ডা মাথায় শোনো, সেকেন্ড অপশনটাই হল, নিজের মেয়ের জন্য ডাক্তার পাত্রের মাকে কব্জা করা।

—ধ্যাৎ, তুমি যে কি বল না!— বেশ ছিলাম, উল্টোপাল্টা সন্দেহ মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, এখন আমি কি করবো।

—কোটরের মধ্যে ঢুকে পড়।

—মানে!

—রান্নাঘর নামে তোমার একটা নিজস্ব কোটর আছে না। জলখাবার বানানোর ছল করে সেখানে ঢুকে পড়।

দিশেহারা সোনালীকে একগাল সমস্যার মধ্যে ডুবিয়ে ফোন কেটে দেয় সুজন। সোনালী এ ঘরে আসার আগেই রিসিভারটা নামিয়ে রাখে মণিকা। অপমানে কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। চোখের কোনো শিরশিরে অনুভূতি। হাতে কয়েকটা এ্যালবাম নিয়ে বসার ঘরে ঢোকে সোনালী। উদগত কান্নাটাকে জোর করে ভিতরে চালান করে মুখে হালকা হাসির মুখোশটা টেনে নেয় মণিকা।

—কর্তার ফোন?

—হ্যাঁ।

—তোদের কত বছর বিয়ে হয়েছে রে, একবছর? এমন ঘন্টায় ঘন্টায় ফোনালাপ। সত্যি বর তো? নাকি অন্য কোনো বর্বর।

—তোর সবটাতেই ইয়ার্কি। একদম আগের মত আছিস। আমার শরীর খারাপ। মাঝে প্রেসারটা খুব বেড়েছিল সে কারণেই বারবার ফোন করে খবর নেয়।

—তাই? বাঃ খুব ভাল। এত কেয়ারিং হাজব্যান্ড, তোর উপর আমার হিংসে হচ্ছে রে।

হাসতে হাসতে বলে মণিকা। গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপে। যার সঙ্গে মনের কথা প্রাণের আলাপ করবে বলে ভেবেছিল তার কাছেই মনের ভাব লুকোতে উল্টোপাল্টা বকতে হচ্ছে। এখান থেকে এখন বেরোতে পারলে বাঁচে। দমবন্ধ লাগছে মণিকার।

—এই শোন না তুই এখন একটু এই এ্যালবামগুলো দ্যাখ, আমি ততক্ষণ চা-টা বানাই। এক্ষুনি মেয়েটা স্কুল থেকে ফিরবে। এসেই তো খাই খাই। ওনার আবার রোজই নতুন নতুন জলখাবার চাই।

—চাই-ই তো। মার কাছে আবদার করবে না তো কার কাছে করবে? তুই জলখাবার বানা আমি এখন আসি।

—এক্ষুনি চলে যাবি? কতদিন পরে এলি...

সোনালীর চোখের কোণে জল, মুখে স্বস্তির রেখা। মণিকা মৃদু হেসে দরজার দিকে এগোয়। দুপাশে সযত্নে লালিত ফুলের বাগান। মাঝখান দিয়ে মোরাম বিছানো পথ গেট পর্যন্ত বিস্তৃত।

—বেশ সুন্দর বাগান করেছিস তো।

—আমি নারে। সব তোর সুজনদার শখ। ফুল গাছ খুব ভালোবাসে। খুব ভোরে উঠে পরিচর্যা করে।

৫

মণিকা কেমন যেন মেলাতে পারে না। যে মানুষ ভালোবেসে এত ফুল ফোটাতে পারে, তার মধ্যে এত নীচতা কেন?

মা...। কোথায় যাচ্ছ?

গেট খুলে এগিয়ে আসছে এক কিশোরী। পরনে স্কুল ড্রেস। মণিকা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে— অবিকল সোনালী। তার কলেজবেলার সবচেয়ে প্রিয় সাথী।

—মণিমাসী? রাইট?

—তুমি আমাকে চেন?

—চিনব না! গত সাতদিনে তোমাদের পঞ্চপাণ্ডরে গ্রুপ ফটোটা মা আমাকে কতবার দেখিয়েছে জানো?

—চলো ভিতরে চলো। আজ তোমার যাওয়া হবে না। আজ আমি তুমি মা তোমাদের ছেলেবেলার মতো সারারাত জেগে গল্প করবো।

মণিকার মনের ভিতর উথাল পাতাল ঢেউ। কানে বাজে সুজন সেনের কথোপকথন।

—তোমার নাম কি মা?

—সোনম।

—তুমি তো মায়ের সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী ছিলে তাই না? তোমার আর মার নাম মিলিয়ে মা আমার নাম রেখেছে। সোনম। সোনালীর দিকে তাকায় মণিকা। সোনালীর ঠোঁটে হাসি, চোখে জল, শরীরী ভাষায় অপারগতা, সব মিলেমিশে একাকার।

মনের ভিতর জমে ওঠা উত্তাপ রূপান্তরিত হয় চোখের জলে। সোনমকে দুহাতে জড়িয়ে কপালে গভীর চুম্বন এঁকে দেয় মণিকা। চোখে জল মুক্তোর দানার মতো ঝরে পড়ে সোনমের মুখে মাথায়। ভিজিয়ে দেয় দুই গাল।